**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.31-37
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

# বিমানে বিশ্বকবির বিশ্ব ভ্রমণ

**প্রিয়া দে**
*গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstact:***
*The Greatest poet Rabindranath Tagore loved to travel. He started first travelling with his father Debendranath Tagore at the age of 11 and the journey was ended when he was 79 years old. He travelled to five continents and 34 countries in total. Traveling was not the purpose of the poet; his main purpose was to convey the culture of India to everyone. He used various vehicles to cover this long journey. Sometimes he used ship, train and plane. He travelled by air in three times in total. The first time was on 16th April, 1921. He came from New York to London by ship. Thereafter, Tagore had chosen aeroplane to travel from London to Paris. For the second time, in May 1921, the poet's visit from Sweden to Berlin was arranged by plane. But this journey was cancelled due to safety of the plane. Then on April 11, 1932, the poet and his daughter-in-law and some other companions traveled to Paris by plane from Dumdum Aerodome. The news of this journey was published in various newspapers of that time. Also the poet himself has recorded his experience of air travel in the book 'Parosye'. On June 3, 1932, he returned to Calcutta by plane from Persia. He enjoyed flying in the sky by ignoring all the prevention and difficulties of air travel.*
**Keywords: World travel, Paris, Birdman, Patrismriti, Swedish Academy.**

"যন্ত্রদানব, মানব করিলে পাখি।
স্থল জল যত তার প্রদানত
আকাশ আছিল বাকি।
বিধাতার দান পাখিদের ডানা দুটি-
আজি এ কি হল, অর্থ কে তার জানে
স্পর্ধা -পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।"[১] (পক্ষীমানব, নবজাতক)

১৯৩২ সালের ২৮শে এপ্রিল কবি তাঁর আকাশ ভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখতে এই কবিতাটি লেখেন। বোমতরী সম্পর্কে এ কবিতাটি লেখার অনেক আগেই কবির বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯২১ সালের ১৬ এপ্রিল ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে আসার সময়ে। এতদিন পর্যন্ত স্থলভাগে ও জলভাগে মানুষের

পদধ্বনি শোনা যেত আর আকাশ ছিল মুক্ত বিহঙ্গীদের কলতানে মুখর। কিন্তু মানুষ আজ আকাশকেও পদানত করেছে আপন শক্তির মহিমায়।

ঘরকুনো বাঙালি বলে যে অপবাদ বা বিশেষণ আমাদের কাঁধে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে সেক্ষেত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন অন্যতম ব্যতিক্রমী ব্যক্তি। তাঁর মতো ভ্রমণ পিপাসুতা বাঙালি ইতিহাসে আর দুটি নেই। তিনি মোট পাঁচটি মহাদেশে এবং ৩৪টি দেশে ভ্রমণ করেছিলেন।নেহাত ভ্রমণই কিন্তু কবির উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সংস্কৃতির দূত হিসেবে সকলের কাছে ভারতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তাঁর এই সফরের সুদীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করতে তিনি যখন যেমন সম্ভব হয়েছে সেরকম যানবাহন ব্যবহার করেছেন। তিনি ঘোড়ারগাড়ি, রেলপথ, জাহাজ এমনকি বিমানের চড়েও ভ্রমণ করেছিলেন।

কবিগুরুর প্রথম আকাশপথে ভ্রমণ করার দিনটি ছিল ১৯২১ সালে ১৬ই এপ্রিল।সেসময় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের নানা স্থান থেকে কবির কাছে আমন্ত্রণপত্র এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত সাহিত্য প্রাচ্যের বিধ্বস্ত ও হতাশা পীড়িত অনুরাগীদের কাছে শান্তির ঠিকানা ছিল। এই আন্তরিক ভালবাসা ও আহ্বানের জন্যই তিনি ১৯২১ সালের শুরুতেই ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের জনজাতির সাথে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।জাহাজে করে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনে এলেও তিনি লন্ডন থেকে প্যারিসের যাত্রার জন্য বোমতরীকেই বেছে নিলেন। সেসময়ের বিমান যাত্রা কিন্তু এখনকার মতো এত নিরাপদ এবং আরামপ্রদ ছিল না। কারণ তখন বিমান তৈরিতে এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধ বিমানগুলিকে যাত্রীবাহী প্লেন হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল।এরোপ্লেনে করে দীর্ঘযাত্রাপথ পাড়ি দেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু কবির কাছে তা ছিল রোমাঞ্চকর অনুভূতির আস্বাদন। ১৯২১ সালের ১৬ এপ্রিল লন্ডনের Croydon বিমানবন্দর থেকে Goliath নামে একটি ছোট বিমানে করে প্যারিসের বিমানবন্দরে আসেন। কবিগুরুর এই প্রথমবার আকাশপথে উড়ান সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন – "সপ্তাহ তিনেক লন্ডনে বাস করিয়া কবি এরোপ্লেন যোগে প্যারিসে গেলেন (১৬এপ্রিল ১৯২১)।ইহাই কবির প্রথম বিমান বিহার।"[২]

রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আলবার্ত কান বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। প্যারিসের Le Bourget বিমানবন্দরে কবির অবতরণের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির চলচ্চিত্র করে রাখা হয় । তাঁর এই বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন রানু অধিকারীকে লিখিত একটি চিঠিতেঃ "ও পাতায় যে পক্ষিরাজের ছবি দেখচ সেই পক্ষিরাজে চড়ে আমরা লন্ডন থেকে সমুদ্র পার হয়ে প্যারিসে এসে পৌঁচেছি। দু'ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ভানুদেবতা এই মর্ত্ত্যভানুর আকাশলীলা দেখে সমস্ত গগনতল পূর্ণ করে হাস্য করেছিলেন- তিনি মনে করেছিলেন এতদিন পরে বুঝি তাঁর এক সঙ্গী জুটে গেল। কিন্তু যখন দেখলেন প্যারিসে এসে আমার পক্ষিরাজের পক্ষ ভূমিতল স্পর্শ করল তখন থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে কেবলই বৃষ্টি পড়চে। আমি তাঁকে কি করে বোঝাব, মর্তের আকর্ষণ আমার পক্ষে এখনো প্রবল-যতই উধাও হয়ে যাই মাটির আহ্বান এড়াতে পারিনে।অতএব মর্তের রবির সঙ্গে আকাশের রবির নিকট সম্বন্ধ কখনো ঘটবে কিনা সন্দেহ, দূর থেকে তাঁর করস্পর্শ মাথায় করে নেব।"[৩]

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। নোবেল কমিটির নিয়ম অনুযায়ী সুইডিশ একাডেমিতে প্রত্যেক প্রাপককে একটি করে বক্তৃতা দিতে হত। ১৯২১ সালের মে মাসে সুইডিশ

একাডেমিতে বক্তৃতা প্রদান করেন। সুইডেন থেকে কবি যাবেন জার্মানির রাজধানী বার্লিন।সেখানকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কবির শারীরিক অসুস্থতার কথা ভেবে ও পথ শ্রমের কষ্ট লাঘব করার জন্য তাদের সেনাবিভাগ থেকে একটি সী প্লেনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সে সময়ের সংবাদপত্র থেকে জানা যায় - "The Government of Sweden tried to help him in his journey in all possible ways and to facilitate his early return to Germany they placed to hydroplanes at his disposal."[৪] প্রস্তাবটি কবির কাছে আরামপ্রদ ছিল এবং বিমান যোগে যাত্রার আয়োজনও শুরু হয়েছিল।কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ আয়োজন বাতিল হয়েছিল। কারণ হিসেবে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে জানিয়েছেন- "সভেন হেডিন বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসে এই খবর পেলেন। খবর শুনে তিনি খুব বিচলিত হয়ে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে সাবধান করে দিলেন, আমি যেন বাবাকে স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা থেকে নিবৃত্ত করি। বললেন, নিজের দেশকে তিনি খুবই ভালোবাসেন সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে সুইডিশ হাওয়াই জাহাজে বাবা বার্লিন যাবেন - এ হতেই পারে না। হ্যাঁ, যদি একজন জার্মান পাইলট পাওয়া যায় তো সে অন্য কথা।"[৫]

সেসময় এই ধরনের প্লেনগুলি যাত্রীনিরাপদ ছিল না । অতঃপর ২৮ শে মে শনিবার কবি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে স্টকহোম থেকে বার্লিনের জন্য রওনা দেন। ফলস্বরূপ এবারও কবির বিমানে করে ভ্রমণ হয়ে উঠল না।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছিল ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু গুণীজন কবিকে অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিলেন, সেগুলির একটি সংকলন 'The Golden Book of Tagore' নামে স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। সে গ্রন্থের মধ্যে একটি অন্যতম শুভেচ্ছা পত্র ছিল শাহেন শাহ রেজা শাহ পাহলেভির স্বাক্ষরিত পত্র। সে পত্রের সাথে একটি আমন্ত্রণপত্রও ছিল, কবিকে পারস্যরাজের আতিথ্য গ্রহণের জন্য। তার সঙ্গে এটাও বলা ছিল পারস্যযাত্রার যাবতীয় ব্যয় পারস্যরাজের এবং সকল আয়োজন পারস্যরাজ করবেন।

কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তীর উৎসব শেষে কবির শরীর এতটাই অবসন্ন যে বিদেশ যাত্রা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। তিনি খড়দায় গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে বিশ্রাম করার জন্য গেলেন। সেসময় সারা বিশ্বে কবি, দার্শনিক ও বিশ্বপ্রেমিক হিসেবে রবীন্দ্র যশঃপ্রতিভা বিদ্যমান। তাঁর একটু পদধূলি, তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর বাণী শোনার জন্য সকল দেশেই আগ্রহে প্রতীক্ষায়মান। তাদের ব্যাকুল চিত্তের আহ্বানই কবিমনকে পারস্য ভ্রমণে উৎসাহিত করে তুলল। কবি ১৮৮৮ সালে তাঁর 'দুরন্ত আশা'কবিতায় যে আশা প্রকাশ করেছিলেন –

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।"[৬]

যেসময় তিনি আরব বেদুইনদের দেশে যাবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন তখন তিনি ৭১ বছরের বৃদ্ধ ছিলেন না। যে কবি একসময়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তিনিই তাঁর শারীরিক অসুস্থতা এবং এতটা দূরবর্তী যাত্রার পথশ্রমের কথা ভেবে বোমতরীকেই পথসাথী হিসেব বেছে নিয়েছিলেন। যদিও ইতিপূর্বে কবি বিমানে ভ্রমণ করেছিলেণ, কিন্তু সেটি ছিল লন্ডন থেকে প্যারিসে যাওয়ার সময়। খুব অল্প সময়ের যাত্রা। আর পারস্যভ্রমণ দীর্ঘ সময়ের পথ। যেতে তিনদিন এবং সেসঙ্গে একটি মরু অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে যা আরব বেদুইন ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এছাড়াও তখনকার দিনে প্লেনে করে এতটা দীর্ঘপথ যাত্রা মোটেও সহজ ও নিরাপদ ছিল না। সেসময়কার প্লেনগুলি ছিল আকারে খুবই ছোট, যেগুলি যাত্রীবাহী প্লেন ছিল সেগুলি এক ঘন্টায় দেড়শ মাইলের মতো গতিবেগসম্পন্ন ছিল। আজকের দিনের তুলনায় যার ভারবহন ক্ষমতা ছিল খুবই অল্প। আর এরোপ্লেনের এত বিকট আওয়াজ,বিষম কাঁপুনি, ঝাঁকানি হতো যে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ করা সহ্য করা তা ভীষণ কঠিন ছিল। আজকের দিনে যেমন খুব সহজেই মানুষ চাঁদে যাচ্ছে বা সেখানে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে,সেসময় বিমানে উঠে এত দীর্ঘপথ যাত্রা বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের প্রলাপ বলে গণ্য হতো। কিন্তু কবির কাছে পারস্য দেশের নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়া অকর্তব্য মনে হয়েছিল। প্রথমে জলপথে যাওয়ার প্রস্তাব হলেও বৃদ্ধবয়সে এতটা দীর্ঘসময়ের যাত্রার থেকে আকাশপথে যাওয়ার প্রস্তাব কবির কাছে আরামদায়ক মনে হয়েছিল। সেসময় কলকাতা থেকে পারস্যের দক্ষিণ উপকূলের বুশীর বন্দর পর্যন্ত যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে ওলন্দাজ কোম্পানির K.L.M. বহর। এই কোম্পানির এরোপ্লেনগুলি একবারও দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি জেনেই কবি এদের প্লেনে যাওয়া মনস্থির করেছিলেন এবং তৎকালীন ওলন্দাজ কন্সালও কবিকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন। ওলন্দাজ কোম্পানি সারাদেশে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের বিমানে চড়ে পারস্যযাত্রা করবেন। কিন্তু এ সময় রবীন্দ্রনাথের কিছু 'খাস রক্ষীদল' নানা প্রকার দুর্ঘটনা, ভয় দেখিয়ে প্রায় নিমরাজি করে ফেলেছিলেন, তখন পরামর্শ হলো প্রথমে একবার পরীক্ষার জন্য প্লেনে ঘুরিয়ে নেওয়ার কথা।

ফ্যান ডাইক (Van Dyck) যিনি একজন প্রসিদ্ধ পাইলট, তিনি দক্ষিণ আটলান্টিক একলা প্লেনে পার করেছিলেন। ইনি কবিকে পরীক্ষামূলক হিসেবে ১২০০০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে কিছুটা ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। সাথে ছিলেন সস্ত্রীক কন্সাল, একজন ডাক্তার ও একজন সাংবাদিক। এই পরীক্ষামূলক উড়ান সফল হল এবং কবিও এবার নিশ্চিন্তে রাজি হলেন। কিন্তু এবার বাধা এলো অন্যদিক থেকে। ওলন্দাজ কোম্পানির উড়োজাহাজ একসঙ্গে দুজনের বেশি নিতে পারবে না। এতে বিরক্ত হয়ে কবি এরোপ্লেন যাত্রাকে পুরোপুরি বন্ধ করে বোম্বাইয়ের পারসিক জাহাজে যাওয়ার আয়োজন করতে বললেন। কিন্তু ওলন্দাজ কোম্পানিও এত বড় বিজ্ঞাপনের সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাননি। পরবর্তীতে এ ব্যবস্থা হলো যে ৪ঠা এপ্রিলের প্লেনে দুজনকে এবং ১১ এপ্রিলের প্লেনে তিনজনকে নিয়ে যেতে তারা প্রস্তুত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিলের প্লেনে যাবেন। কবি ও তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তী ১১ই এপ্রিলের প্লেনে যাবেন। কবির পারস্যযাত্রা সম্পর্কিত বিভিন্ন খবর তৎকালীন প্রায় সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। ২৪ মার্চ ফ্রী প্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল - "পারস্যের শাহ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১এপ্রিল তারিখে পারস্যযাত্রা করিবেন বলিয়া বর্তমানে স্থির করিয়াছেন। কবির সহিত শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারিও যাইবেন।করাচি হইতে তাঁহারা বিমানযোগে যাইবেন।"[৭]

কেবলমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকাই নয়, সমসাময়িক দেশি-বিদেশি বহু পত্রিকাতে কবির পারস্যভ্রমণ সংক্রান্ত সংবাদ ছাপা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে Star London, Evening news London, Daily news Colombo, Liberty প্রমুখ সংবাদপত্র।

১১ ই এপ্রিল কবি খড়দহর বাড়ি থেকে ভোরবেলা দমদমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। ঘুমন্ত গ্রামের আঁকাবাঁকা গলির মধ্য দিয়ে মোটর গাড়ি চলেছে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে। বিমানে ওঠার অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন তাঁর 'পারস্যে' গ্রন্থে - "সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জনে যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বৌমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার দোলা ওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে – ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।"[৮]

কবির বিমানরথটি ছিল F.12type। এটি সাইজে অনেকটা বড় এবং বেশি আরামদায়ক। প্লেনটির নীল গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা নাম। পাখাগুলি বড় এবং লেজটি মোটা পালযুক্ত যেন নীলরঙের গৃধিনী আকাশে ডানা মেলে রয়েছে। সেসময় এদেশ থেকে বিমানপথে বিদেশের সাথে সংযোগ রাখে তিনটে কোম্পানির উড়োজাহাজ। ইংরেজ কোম্পানি ছাড়া ওলন্দাজ রাজকীয় ডাকবাহী প্লেন জাভা থেকে আমস্টারড্যাম - রেঙ্গুন – কলকাতা – করাচী হয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে যাতায়াত করে। এছাড়া ফরাসী প্লেনগুলো প্রতি ১৫ দিনে একবার যায়। এটি ছোট ফোকার প্লেন হলেও দ্রুতগতিতে যায় কিন্তু ওলন্দাজ বিমানগুলি সবথেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিরাপদ এবং নিয়মিত। তখন প্রেমগুলি শুধু দিনের আলোতেই চলাচল করত।

দমদম এরোড্রাম থেকে বাযুতরীটি ছাড়ার পর কবি উপর থেকে বাংলাদেশের গ্রামীন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন।সকাল প্রায় দশটার সময় এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বিমানটি মাটিতে এসে ঠেকল। বামরুলি এরোড্রমটি শহর থেকে কিছুটা দূরে। কবি তাঁর বাযুতরীটি থেকে নামেননি কিন্তু কোম্পানির একজন ভারতীয় কর্মচারী কবির ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। এসময় যন্ত্রটিতে তেল ভর্তি করে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে এত দুঃসহ গর্জন ছিল যন্ত্রটির যার জন্য কবি দু'কানে তুলো গুঁজে জানলা দিয়ে নিচের সৌন্দর্য অবলোকন করছেন। বিমানে কবি ও তাঁর পুত্রবধূ এবং অমিয় চক্রবর্তী ছাড়াও ছিলেন একজন দিনেমার, যিনি ম্যানিলা দ্বীপে আখের ক্ষেতের তদারক করেন। তিনি কলকাতা থেকে নানা ধরনের সংবাদপত্র সংগ্রহ করে স্বদেশে চলেছেন। আগাগোড়া তাই খুঁটিয়ে পড়ছেন। যন্ত্রের হুংকারে যাত্রীদের মধ্যে আলাপের চেষ্টা বৃথা। উড়োজাহাজটি অপরাহ্নে যোধপুর শহরে এসে পৌঁছাল। যোধপুরে কবিকে অভ্যর্থনা করার জন্য সেখানকার সচিব কুনবার মহারাজ সিং উপস্থিত ছিলেন।তারপর কবি মহারাজের বিমানযাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোটেলে উঠলেন।

নদ- নদী, তেপান্তরের মাঠ, ছোট বড় শহর সব কিছুকে নিচে ফেলে কবিকে নিয়ে উড়ে জাহাজ হু হু করে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে। ১২ ই এপ্রিল বাযুতরীটি করাচীতে পৌঁছায়। করাচীতে মেয়র মি:জামসেদ নীসের বানজী, প্রসিদ্ধ উদ্যানতত্ত্ববিদ মিঃচট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রসাহিত্য নাট্য পরিষদের' সভাপতি মিঃ তোলা সিং আদবানি এবং ২০০ জন পুরুষ ও প্রায় ২৫জন মহিলা এদিন ড্রিগ রোডে সিভিল এরোড্রমে বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা করেন। সেসময় করাচীর সিন্ধু অবজর্ভার পত্রিকা তাঁদের ১২এপ্রিলের কাগজে লিখছেনঃ

"প্রায় ৯টা ১৫ মিনিটের সময় বিমানপোতখানি দৃষ্টিগোচর হয় এবং পোতটি কিয়ৎকাল বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ৫ মিনিট পরই অবতরণ করে। পোতের কাচের জানালার মধ্য দিয়া শেতশ্মশ্রুবহুল সৌম্য মূর্তি দেখা যাইতেছিল। তিনি অবতরণ করিলে সমবেত জনতা নিস্তব্ধভাবে করজোড়ে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং তিনিও স্মিত হাস্যে জনতাকে অভিবাদন করেন। ...রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্তনকালে ইস্পাহান ও সিহিরাজ পরিভ্রমণ করিবেন। তাঁহার সেক্রেটারি বলেন যে - প্রাচ্যজাতিসমূহের ঘনিষ্ঠতা সাধনই রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য। প্রাচ্যে পারস্য একটি উন্নতশীল দেশ। তিনি বিমানপোতের চালকের নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার ভুয়সী প্রশংসা করেন।"[৯]

বেলা ১১টার সময় বিমান করাচী থেকে জাস্কের অভিমুখে যাত্রা করেছে। সিন্ধুর ধূসর মরুদেশ পার হয়ে একদিকে বেলুচিস্থানের উজ্জ্বল বালুকাভূমি এবং অপরদিকে পারস্য উপসাগরের গভীর নীল জল অতিক্রম করে কবিকে নিয়ে ছুটে চলেছে।বুশেয়ার থেকে সেখানকার গভর্নর আকাশের নিরুদ্দেশ পথ দিয়ে বেতারে কবিকে স্বাগত অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। এই অভিনন্দন বার্তাটিকে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর একটি চিঠির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন: "বুসেয়ার হইতে জনাব ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি- আপনি পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছাইয়াছেন। সুতরাং আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অভ্যর্থনার জন্য আমি আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছি।"[১০]

এটি ছাড়াও যাস্কের বেতার স্টেশন থেকে অভ্যর্থনা এসেছিল। বেলা আড়াইটের সময় কবি ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বোমতরীটি যাস্কের মাটিতে পদার্পণ করেছে। আশ্রমযাত্রীদের জন্য পান্থশালায় বসে কবি নিবিড়ভাবে গোধূলিবেলা উপলব্ধি করছেন। এখানে কবিকে সম্মান সম্ভাষণা জ্ঞাপনের জন্য রাজকর্মচারীরা এসেছিলেন। পরদিন ভোর চারটের সময় যাস্ক থেকে আবার যাত্রা শুরু। ১৩ই এপ্রিল বেলা দশটার সময় ভীষণ ঝড় তুফানের মধ্যে কবির পুষ্পক রথ বুশেয়ারে এসে নামল। বোম্বাই থেকে স্থলপথে দিনশা ইরানি সদলবলে কবির সঙ্গী হলেন। ডেপুটি গভর্নর, একদল রাজকর্মচারী, একদল বয়স্কাউট কয়েকজন সেপাই এবং বাইরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কবিকে অভ্যর্থনার জন্য এরোড্রমে হাজির।

ধরাতলের রবির সাথে ঊর্ধ্বলোকের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি তাঁর 'পারস্যে' গ্রন্থে : "ছেলেবেলা থেকে আকাশে যেসব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর রৌদ্রে চীলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম,মনে হতো দরকার আছে বলে উড়ছে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার করে চলেছে। এই বোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সংকোচ বোধ না করে থাকতে পারিনে। অতি আশ্চর্য এ যন্ত্র, যার সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে কিন্তু শক্তির জন্য যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে - সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্তের দুষ্মন্তেরা মাঝেমাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন - আমারও সেই দশা। "[১১]

পারস্যযাত্রায় কবি আকাশপথে প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। যাত্রাপথে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লেও ফেরার পথে বিমান ভবনে আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখেননি।প্রাচ্যের দুটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ইরাক ইরান ভ্রমণ শেষে কবি বাগদাদ থেকে ডাচ বিমানে করে ফিরেছেন। ১১ এপ্রিল ১৯৩২ থেকে ৩ জুন ১৯৩২ অর্থাৎ একমাস বাইশ দিনের সফর শেষ করে কবি কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন। কবির ৮০ বছরের দীর্ঘজীবনে এটাই শেষ বিমান বিহার।

**তথ্যসূত্রঃ**


**১.** ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী,জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃষ্ঠা-১১৯

২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার: রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪২৬,পৃষ্ঠা-৭৫

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: চিঠিপত্র (অষ্টাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২০,পৃষ্ঠা-১০৭

৪. পাল, প্রশান্ত কুমার: রবি জীবনী (অষ্টম খন্ড), পঞ্চম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২০,পৃষ্ঠা-১৪৪

৫. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ: পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, পুনর্মুদ্রণ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৯৫, পৃষ্ঠা-২৭১

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২২, পৃষ্ঠা-২৯০

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত): আনন্দবাজার পত্রিকা (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ-৩), আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩০৩

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী,মাঘ ১৪২৬, পৃষ্ঠা-৩২৬

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত): আনন্দবাজার পত্রিকা (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ-৩), আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩০৫

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়,চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত): আনন্দবাজার পত্রিকা (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ-৩), আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩০৬

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খন্ড), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২৬, পৃষ্ঠা-৬৩০